MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

DEPT OF BENGALI (UG)

ASSIGNMENT

TOPICS: 1. বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের অবদান আলোচনা করো।

2. বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান আলোচনা করো।

3. বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করো।

Full Name:→ RISITA JANA

Roll No:→ 79

Class:→ B.A (Hons)

Sem:→ III

Academic year:→ 2023-24

Date of Submission:→ 30/11/2023

Risita Jana
Student's Signature

14.12.23
Professor Signature

(1) বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের অবদান—

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। এই যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রিঃ। তারপর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিক যুগের কাব্য সৃষ্টি করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬০ খ্রিঃ থেকে। মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়টিতে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনো উৎকর্ষপূর্ণ সৃষ্টি দেখা যায় না। তখন বাংলা গদ্যের উদ্ভব কাল। এই সময়ের সাময়িক বাংলা সাহিত্যে বিরাজমান ছিলো যুগসন্ধির বৈশিষ্ট্য, কবি ঈশ্বরগুপ্তের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল এই সময়েই, তাই বাংলা সাহিত্যে তিনি যুগসন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে পরিচিত। বাংলা সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সব্যসাচীর মতো দু হাতে দু দিকের নির্দেশ দিয়েছেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত।

কবি ঈশ্বরগুপ্ত সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত ১৮৩১ সাল থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান লেখক। অজস্র কবিতা রচনা করেছেন। সংবাদ পত্রের পাতায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম তাঁর কবিতাগুলিকে 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। তবে অশ্লীলতার

কারণে তিনি সব কবিতা সংগ্রহ করেননি।
তাঁর অন্যান্য রচনাগুলি হলো —
(i) 'কালীকীর্তন' - রামপ্রসাদ সেন লিখিত,
(ii) 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত'- ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত।
(iii) 'প্রবোধ প্রভাকর' - নিজস্ব কবিতার সংকলন।
(iv) 'হিত প্রভাকর' - হিতোপদেশের গল্পকাহিনী পদ্যে রচিত।
(v) মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলির সার সংগ্রহ- কবিভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে সংগৃহীত কবিতার খণ্ড খণ্ড সংকলন।
(vi) বোধেন্দু বিকাশ — নাটক।
(vii) সত্যনারায়ণের — ব্রতকথা।
(viii) পত্রিকা সম্পাদনা- সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক ১৮৩১) দৈনিক (১৮৩৯)
(ix) সংবাদ রত্নাবলী (১৮৩২)
(x) পাষণ্ডপীড়ন (১৮৪৬)
(xi) 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (১৮৪৭)

সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের খ্যাতি সর্বাধিক। তাঁর ব্যঙ্গ রস প্রবণতা ও লঘু চপল ভঙ্গি কবিতাগুলিকে উৎকর্ষতা দান করেছে। সে সময়ে ইংরেজি শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালি বাঙালি সমাজে ও জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল ঈশ্বর গুপ্ত তাকেই কবিতার উপজীব্য করেছেন। যেখানেই সামাজিক অনাচার, চারিত্রিক দৈন্য ও আদর্শ হীনতা দেখেছেন সেখানেই তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রাচীন নবীনের কোনো পার্থক্য করেননি। তাঁর সমাজ সংক্রান্ত কবিতার বিষয়বস্তু ছিলো বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন- বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরোধীতা, কৌলীন্য প্রথার অপকারিতা, বাঙালির সাহেবিয়ানা অনুকরণপ্রিয়তা, স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে সমাজের বিকৃতি ও প্রাচীন সনাতন স্ত্রী ধর্ম লোপের আশঙ্কা, গো হত্যা, জমিদারদের অনাচার- ব্যভিচারের বর্ণনা, অভাব ও দুর্ভিক্ষ, ইয়ং বেঙ্গলের [illegible] অমর্যাদা, নীলকর সাহেবের অত্যাচার-অবিচার ইত্যাদি।

ইংরেজদের আচার-আচরণকে এদেশের লোক অনুকরণ করে মনে করে ইংরেজিয়ানার প্রতি ব্যঙ্গ করে ইংরেজী 'নববর্ষ' কবিতায় লিখেছেন —

"ধন্য রে বোতলবাসী ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার ফল।।" —

তাঁর 'বাঙালির মেয়ে' কবিতায়ও অতীত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিলোনা বলে তিনি লিখেছেন —

"লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিলো,
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া।
ঠাট-ঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া।" —

'নীলকর' কবিতায় নীলকরদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কবি মহারানী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন। তাতে নিজের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পরিহাস মধুর মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে —

"তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো
কেবল খাবো খোল বিচালী ঘাস।
যেনো রাঙা আমলা, তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না;
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হবো
ঘুসি খেলে বাঁচবো না।" —

তুচ্ছ বিষয়েও তাঁর কৌতুক রসের প্রকাশের স্থান করে নিয়েছে। যেমন — 'পাঁঠা' কবিতায় তিনি লিখেছেন —

"রসভরা রসময় রসের ছাগল,
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।।" —

বাঙালীর অন্তঃপুরের বিভিন্ন ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত যেসব কবিতা রচনা করেছেন তাও বেশ সুখমধুর —

"আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর,
গড়িতেছে পিঠে পুলি অশেষ প্রকার।।"
বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা।।" —

কবিতার চারপাশে যে সব মানুষ দেখেছেন তার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এমন কি তাঁর মনে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ অম্লান ছিলো নিজের ব্যবহারে-আচরণে-কর্মেও সেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ তিনি দেখতে পাননি, তাই লিখেছিলেন —

"স্বরূপ মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমি তো মানুষ নিজে নই।" —

ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মবিষয়ক কবিতার আলোচনায় দেখা যায়, ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিবাদী। পূর্বসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের উপর তাঁর আধ্যাত্মিক ভক্তির মূল প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই যেখানে অন্ধ গোঁড়ামিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। ধর্মের নামে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেখানেই তিনি প্রকাশ স্বস্ফূর্ত।

স্নানযাত্রা কবিতাটিতে রয়েছে এইরকমই প্রকাশ। সেযুগের সামাজিক নৈতিক ব্যভিচারের একটি চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় মহেশের স্নানযাত্রায় —

"চরণে বিলাতি জুতো পরিলেন বৌপরুতি
হারিলেন পৈতৃক অসড়।
চাপাতলা ক্ষুণ্ণ করি যান যত নব হরি
ঘষ ঘষ ঘষড় ঘষড়।।" —

স্বদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ ঈশ্বর গুপ্তের আরেকটি আধুনিকতার লক্ষণ বলে ধরা যেতে পারে। 'স্বদেশ' কবিতায় তিনি লিখেছেন —

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসী গণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।।" —

ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় ইতিহাস চেতনার পরিচয়ও রয়েছে। প্রাচীন কবিদের জীবনী ও কাব্য রচনার মাধ্যমে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। সমকালীন যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়েও কবিতা রচনার নিদর্শন তাঁর আছে। এদিক থেকে তিনি প্রথম আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত কবি। আসলে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় প্রাচীন ও নবীন দুই যুগের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি যুগের পরিবর্তন গ্রহণ করতে পারেননি বলে প্রাচীনপন্থী প্রমাণ মেলে। কবিওয়ালাদের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে সে যুগের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। নতুন ভাবধারায় সম্পূর্ণরূপে অবগাহন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়নি বলে তাঁর সম্পর্কে বলা হয় —

"ঈশ্বরগুপ্ত আধাটিকে পুরাতনো, বিশ্ব ভাবে নতুন।" —

ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সাংবাদিক। চারিদিকে যা দেখেছেন কৌতুক সহকারে তাই ফুটিয়ে তুলেছেন। গভীর জীবনবোধের পরিচয় তাঁর কবিতায় নেই। জীবনকে হালকাভাবে দেখার একটি বিশেষ দৃষ্টি তাঁর ছিল বলে সমস্ত বিষয়ে তিনি রসেরসের প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন। তিনি সমগ্র বিশ্বকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

বলে তাঁর রচনায় সূক্ষ্মতা বা গভীরতা ছিলনা। তাই তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়—

"ঈশ্বর গুপ্ত সামসাময়িক ঘটনার কবি, লৌকিক আচার ও সামাজিক পরিস্থিতির কবি, গভীর জীবন বোধের কবি নয়।"—

আবার এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তা থেকেই হয় তাঁর সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা, তিনি লিখেছেন—

"ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চুলের কাঁটায় রান্নাঘরের ধুঁয়ায় নাটের মাঝির ধ্বনির ঠেলায়, নীলের দাদনে হোটেলের খানায়, পাঁঠার অস্থিস্থিত মজ্জায়, তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপসে মাছে মৎস্যের ভাব ছাড়া ~~অন্য~~ তপস্যা ভাব দেখেন, পাঁঠার বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধিচীর গায়ের গন্ধ পান, স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist।"—